যে দেশে মানুষ বড়

জসীমউদ্দীন

জসীমউদ্দীন, স্বনামখ্যাত, প্রগতিবাদী কবি। সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে ১৯৬৮ সালে তিনি সে দেশে যান। রাশিয়া ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন 'যে দেশে মানুষ বড়' বইয়ে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে জসীমউদ্দীনের রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ এ সংখ্যায় ছাপা হল

আমি সারা জীবন আমার দেশের জনগণকে লইয়া সাহিত্য করিয়াছি। তাহাদের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা লইয়া কবিতা লিখিয়াছি, নাটক লিখিয়াছি, উপন্যাস লিখিয়াছি। আমার খুব বড় স্বপ্ন ছিল একবার সোভিয়েত দেশে যাইব। সে দেশের রাষ্ট্র কিভাবে তার জনগণকে সব চাইতে বড় আসন দিয়াছে, কিভাবে মূক জনগণকে তার আজীবনের কুসংস্কার, অন্ধগোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতা হইতে মুক্ত করিয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে সেই দৃশ্য নিজের চোখে দেখিয়া আসিব। আরও শুনিব সেই উৎসর্গিত-প্রাণ মহামানবদের কথা যাঁহারা তিলে তিলে জীবন দান করিয়া দেশের অগণিত মানুষগুলিকে পীড়নের আর শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ... কিছুদিন মস্কো শহরে ঘুরিয়া একদিন বিকালে লেনিনগ্রাডে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সেই লেলিনগ্রাড, যার নগর প্রান্তে দুর্ধর্ষ জার্মান অভিযান প্রতিহত হইয়াছিল। জীবনদানের এই সেই মহাযজ্ঞভূমি। ভয়কে এদেশের লোক তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল। তাই ভয় ইহাদের ভয়ে পালাইয়াছিল। মৃত্যুকে ইহারা মানে নাই। তাই মৃত্যুকে ইহারা জয় করিতে পারিয়াছিল।

লেনিনগ্রাডে আসিয়া প্রথমেই আমার পরিচালককে বলিলাম, 'স্বাধীনতাকামীর চির-তীর্থভূমি আমাকে সেইখানটিতে লইয়া চলুন, যেখানে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আপনাদের দেশের বীর-পুত্রেরা জন্মভূমির জন্য জীবনদান করিতে আসিয়াছিলেন। নানাপথ ঘুরিয়া আমাদের গাড়ি সেই স্থানটিতে আসিয়া পৌঁছিল। একটি ট্যাঙ্ক রাখিয়া স্থানটি চিহ্নিত করা হইয়াছে। ডানদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। বামধারে একটি পার্ক। ট্যাঙ্কের পাশে কয়েকখানা টুল পাতা। তারই একখানায় বসিয়া মানস নয়নে আঁকিতে লাগিলাম এই মহা কাহিনীর ইতিহাস। যে দুর্ধর্ষ জার্মান-বাহিনীকে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কত লৌহ দেওয়াল পদাঘাতে তাহারা বিচূর্ণ করিয়া দিয়া আসিল; কত পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র যাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারিল না, এখানকার মানবদেহের দেয়াল তাহারা ডিঙাইতে পারিল না। মানস নয়নে আমি যেন দেখিতে পাইলাম, দলে দলে বীর সেনানীরা এখানে আসিয়া জীবনদান করিয়া যাইতেছে — একদল শেষ না হইতেই আর এক দল এখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—পাথরের দেওয়ার ভাঙিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মানব দেহের দেয়াল ভাঙিলে আবার গড়িয়া ওঠে। মানস নয়নে যেন দেখিতে পাইতেছি কত মাতা সন্তানকে শেষ চুম্বন দিয়া বিদায় দিতেছে, কত বধূ তার দয়িতকে বীরের মতো সাজাইয়া এখানে পাঠাইতেছে, কত পিতা, কত পুত্র, কত বন্ধু, কত আত্মীয় আপনার প্রিয়জনকে হাসিমুখে এই মরণযজ্ঞে পাঠাইয়া দিতেছে। এ কোন মমতা— এ কোন প্রেম! ভাবিতে ভাবিতে দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়। ওরা দেখিয়া যাইতে পারে নাই, ওদের আত্মদানে দেশের কোন শুভ আসিয়াছে, ওরা ভাবিয়াছিল আমরা মরিয়া যদি যাই দেশের অনাগত ভাই-বোনেরা দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিবে না— এই পৃথিবীকে তাহারা আবার নতুন করিয়া গড়িয়া লইবে। ওদের জয়ে শুধু রাশিয়ারই জয় হইবে না, রাশিয়ার সাম্যবাদের নতুন জয় হইবে। এই মন্ত্র রাশিয়ার চৌহদ্দি ডিঙাইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। যেখানে মানুষ আজও পর পীড়নের আঘাতে জর্জরিত, শোষকের কারাগারে মানবতা, দয়া-প্রেম অবলুণ্ঠিত সেখানে শান্তির বাণী বহিয়া আনিবে। এই ময়দানে বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসিল। কী মহান মৃত্যু—কী মহান আত্মত্যাগ। পৃথিবী মাতা এখানেই তার আদরের সন্তানদিগকে আঁধারের আবরণে জড়াইয়া লইলেন। এই মহান ঘুমের আবহাওয়াকে আপনার অস্তিত্ব দিয়া আর ব্যাঘাত করিতে চাহিলাম না। ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম।

...এখান হইতে গেলাম লেনিনের স্মৃতি মিউজিয়াম দেখিতে। এখানেই লেনিন তাঁহার বিপ্লবের কাজ আরম্ভ করেন। যে চেয়ারে বসিয়া, যে টেবিলখানি সামনে রাখিয়া মহামতি লেনিন লেখাপড়া করিতেন, যে বিছানায়

তিনি শয়ন করিতেন, তাঁর কাগজ কলম, আসবাবপত্র সকলই তাঁর জীবিতকালে যেখানে যেমন ছিল তেমনই আছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথা, আদেশপত্র, চিঠি সবই গ্লাস-কেসে রহিয়াছে;তাহা ছাড়া ঘরের দেয়ালে লেনিনের জীবনের কয়েকটি ঘটনা চিত্রিত আছে। বিপ্লবের পর রুশ দেশে একটি সামরিক গভর্নমেন্ট তৈরি হয়। এই গভর্নমেন্ট ধনিকদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করিয়া চলিতেছিল। এই ঘর হইতেই লেনিন তাঁর অনুগামীদের সেই সামরিক গভর্নমেন্ট ভাঙিয়া দিতে আদেশ করেন। সে দৃশ্যও দেয়ালে আঁকা রহিয়াছে। এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে কেবলই মনে হইতেছিল, এই বিরাট পুরুষ, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে শত শত যুবক মৃত্যুকে অবহেলা করিত, কী সাধারণ, কী সহজ ছিল তাঁর স্বকীয় জীবনযাপন! এই মহামানুষ মরিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকে কেহ বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু সমস্ত সোভিয়েত ভরিয়া নানা ছবিতে, মূর্তিতে, জীবনালেখ্যে তাঁহাকে সমগ্র জাতির চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে এ দেশের রাষ্ট্র কোন রকমের প্রকাশ-ভঙ্গিকেই অবহেলা করেন নাই। ...বিকালে ৭-৩০ মিনিটে গেলাম এখানকার মালি অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারের একটি নৃত্যনাট্য দেখিতে। ইবসেনের সালবেগ নাটকের গল্পাংশ অবলম্বন করিয়া এই নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছে। চীন দেশের মতো বর্তমান কালের রাশিয়া তার সহিত্যকলাকে শুধু প্রচারযন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিতেছে না, এ দেশের লেখকেরা সাহিত্যবিভাগের নানা দিগন্তে বসিয়া এক একজন এক এক রকমের সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছেন। ... মানব মনের যতগুলি প্রকাশের পথ আছে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তার সবগুলি দরজাই শুধু খুলিয়া দেন নাই, জনগণ যাহাতে সেই পথে আগাইতে পারে রাষ্ট্র সে জন্যও কম সতর্ক নয়। সোভিয়েত দেশের নৃত্যকলা যাহা বিশ্বের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে, কোনও দেশের নৃত্যকলাই এদের মতো জনগণের স্বীকৃতি পায় নাই।

আরও বহুপথ এই পাইন বনের মধ্যে ঘুরিয়া আমাদের গন্তব্যস্থান পায়নিয়র কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ফিরিবার পথে অনেক কথা ভাবিতে লাগিলাম। দেশের রাষ্ট্র সব চাইতে জোর দেয় তার ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সংগঠনে। দুই বছর বয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষাকার্য আরম্ভ হয়। নানা রঙের ছবি দেখাইয়া, নাচ শিখাইয়া, গান শিখাইয়া, বহু রকমের গল্প বলিয়া সুদক্ষ শিক্ষয়িত্রীদের হাতে শিশুদের প্রথম ছয়টি বৎসর কাটে। তারপর ছোটরা যায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। সেখানে যাইয়া তাহারা বই পুস্তকের শিক্ষা আরম্ভ করে। বিগত বৎসর ছবি দেখিয়া, গান শিখিয়া, গল্প শুনিয়া, দেশের ইতিহাস ভূগোলের অনেক কিছু তাহারা শিখিয়া আসিয়াছে। তাহাদের অজ্ঞাতে কখন যে বর্ণমালা শিখিয়া আসিয়াছে শিশুরাও জানে না। আট বৎসর ধরিয়া তাহারা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তম বৎসরে শিক্ষকেরা অনুসন্ধান করেন স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কোন শিশু কোন বিদ্যা শিখিতে চায়। যে সব শিশু বিজ্ঞান বিভাগে যাইতে চাহে তাহাদের প্রধান শিক্ষক আলাদা করিয়া রাখেন। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশমতো বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আসিয়া তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহারা বিজ্ঞান পড়িবার উপযুক্ত কিনা তাহা জানিয়া লন। পরে তাঁহাদের মনোনীত ছাত্ররাই শুধু বিজ্ঞান পড়িবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এইভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে, ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে, উড়োজাহাজ নির্মাণে, উড়োজাহাজ চালনায় নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা আসিয়া স্ব স্ব বিভাগের ছাত্র নির্বাচন করিয়া যান। বিশেষজ্ঞরা যে সব ছাত্রকে নির্বাচন করেন না, তাহারা বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার উপযুক্ত হইতে আরও কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুকাল হইতে সর্বোচ্চ শিক্ষা সোপান পর্যন্ত কোনও ছাত্রকেই বেতন দিতে হয় না। তাহাদের বই পুস্তকের ব্যয়ভার সরকারই বহন করে। সুবিস্তীর্ণ সোভিয়েত দেশ জুড়িয়া বহু রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল পাতা। শিশুকাল হইতেই শিশু যাহাতে কোনও মিথ্যা কুসংস্কার বা অন্ধগোঁড়ামি শিক্ষা না করে তাহার পাঠ্য বইগুলিতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তেমনি নিবন্ধাবলী রচনা করা হয়। আমাদের দেশে যেমন শিশুরা ইতিহাসের ক্লাশে বাবা আদমের কাহিনী হইতে মানুষের জন্মবৃত্তান্তের ঘটনা শিখিতে আরম্ভ করে, আবার বিজ্ঞানের ক্লাসে যাইয়া ইভোলিউশনের থিওরি শিখিয়া দুই বিপরীত ঘটনা লইয়া মুশকিলে পড়ে, এ দেশের শিক্ষায় তেমন হইতে পারে না। বিজ্ঞানের গবেষণা-যন্ত্রে যে তথ্য টেকে না তাহা সোভিয়েত দেশ বিশ্বাস করে না। ছাত্রদিগকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ...

লেনিনগ্রাডে থাকিতে একদিন গেলাম সেখানকার একটি সমবায় ফার্ম দেখিতে। নানা পথ ঘুরিয়া খামার গেটে যাইয়া উপস্থিত হইলে কৃষি খামারের চেয়ারম্যান আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানে একটি নাট্যশালা আছে। সেখানে এখানকার শ্রমিকেরা মাঝে মাঝে অভিনয় করেন। বর্তমানে যারা ভাল গাইয়ে, নাচিয়ে তারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে নাচ-গান করিতে। সুতরাং, এখানে কোনও গান শোনার বা নাচ দেখার সুযোগ হইল না।

এই ফার্মে কত লোক কাজ করে, কী কী ফসল উৎপাদন করিতে এই ফার্ম কতটা উন্নতি করিয়াছে তাহার একটি ফিরিস্তি দিয়া এই নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমেরিকায় দেখিয়াছি এক বৎসর অন্তর চাষের জমিকে পতিত ফেলিয়া রাখা হয়। তাতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সোভিয়েত দেশে জমির অভাব নাই। তবু এ দেশের জমি এক বৎসরের জন্য পতিত ফেলিয়া রাখা হয় না। খামার সংলগ্ন ল্যাব-রেটরিতে জমির মাটি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞরা বলিয়া দেন, পরবর্তী বৎসরে জমিতে কী কী সার ব্যবহার করিতে হইবে। সেই অনুসারে সার ফেলিয়া প্রতি বৎসরই ইহারা প্রচুর শস্য লাভ করে।

এ দেশে শস্যে কীট পোকার উপদ্রব হইতে পারে না। কারণ শস্য-ক্ষেতের আশেপাশে যতো আগাছা জন্মে তাহাতেই কীট পতঙ্গের জন্ম হয়। তাই আশেপাশের যত আগাছাগুলিকে কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। জমিতে শস্য বপনের সময় কীটনাশক কিছুটা ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে ক্ষেতে কীট পোকার উপদ্রব হয় না। আমাদের দেশে কীটনাশক বিশেষজ্ঞদের মতো আগে জমিতে কীট পোকার অবাধ বংশ বিস্তারের সুযোগ দিয়া পরে স্থানে স্থানে কীটনাশক ঔষধ ছড়াইয়া গোরু এবং মানুষের জীবন বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে না। জমিতে বীজ বুনিতে ইহারা সবচাইতে ভাল ফসলের বীজ সংগ্রহ করিয়া লয়। ভাল বীজ উৎপন্ন করিতে এ দেশের কত গবেষণা। ফসল উৎপাদনে কাহারও গাফিলতি এ দেশের রাষ্ট্র সহ্য করে না। এমন যে দুর্দণ্ডপ্রতাপ ক্রুশ্চেভ, তাঁকেও ক্ষমতা হইতে সরিয়া যাইতে হইল, তাহার প্রধান কারণ তাঁর আমলে সোভিয়েত দেশে ভালমতো ফসল উৎপন্ন হয় নাই।

লেনিন যখন প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রধান উপদেশ ছিল দেশের বিদ্যুৎশক্তি বাড়াও আর সকলকে শিক্ষা দাও। বিদ্যুৎশক্তি বাড়াইলে দেশের অসংখ্য মিলগুলিতে বহু কলকব্জা আর শিল্পজাত সামগ্রীই তৈরি হইবে না, বিদ্যুৎশক্তির বলে সর্বত্র জলপ্রবাহ বহাইয়া সমস্ত দেশকে শস্য সম্পদে ভরিয়া তুলিবে। আজ রুশ দেশ বিদ্যুৎশক্তিতে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।... পথে আসিতে আসিতে চেয়ারম্যান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার বাগানে এত ফল পাকিয়া আছে, চোরে চুরি করিয়া লয় না?' তিনি বলিলেন, 'প্রত্যেকের বাড়িতেই কত ফল ফলিয়া আছে। কে কত খাইবে। কেউ চুরি করে না।' এখানে সমবায় কৃষি ফার্ম হওয়ার আগে চেয়ারম্যান সাহেবের বাবা এদেশের একজন বর্ধিষ্ণু কৃষাণ ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ একরের মতো জমি ছিল। কিন্তু সে জমিতে জলসেচন ও সার প্রয়োগের অভাবে তেমন ভাল ফসল হইত না। এখন জমি কৃষি খামারকে দিয়া তিনি সুখেই আছেন। কৃষি খামার হইতে বিদায় লইয়া শহরে ফিরিয়া চলিলাম। পথের দুই পাশে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল এই বর্ষায় আমাদের পুরাতন প্রজা মনু শেখের পুত্র, ছেলে-মেয়ে-বউকে খাইতে দিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। ভাসান চরে বন্যা আসিয়া প্রতি বৎসর ফসল ডুবাইয়া দিয়া যায়। অসহায় কৃষকেরা ভিখারীর বেশে শহরে, বাজারে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যে বছর বৃষ্টি হয় না, প্রখর গ্রীষ্মের খর-দাহনে ধানের অঙ্কুর পুড়িয়া যায়। অসহায় কৃষক আকাশের পানে চাহিয়া প্রার্থনা করে 'আল্লা মেঘ দাও, পানি দাও'। যে বৎসর সময়কালে আল্লার মেঘ নামে না সে বৎসর ইহাকে বিধিলিপি মনে করিয়া আপন কপালে শুধু করাঘাত করে। তারপর দুর্ভিক্ষ আসিয়া তার আদরের সন্তান-সন্ততিগুলিকে চিরকালের ঘুম পাড়াইয়া দিয়া যায়। আজ আমাদের দেশে লেনিনের মতো এমন নেতার জন্ম হইতে পারে না, যার আগমনে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশ এমনই ধনধান্যে সাজিয়া ওঠে! ...

দুপুরে চলিলাম তাসখন্দের মসজিদ দেখিতে। সকাল বেলা নানা স্থানে ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম। আমার অজানিতেই বারানভ সাহেব সেখানে আমার ভ্রমণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হইল। আমাদের দেশে কত শত শত মসজিদ। সমাজতান্ত্রিক দেশে আসিয়া মসজিদ দেখিয়া আমার কী লাভ হইবে? বারানভ সাহেব বলিলেন, 'সেখানকার কর্তৃপক্ষেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া চলুন।' সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়িতে যাইয়া বসিলাম। সত্য সত্যই সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনেকক্ষণ নামাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন ছিল জুম্মাবার। প্রায় আড়াই হাজারের মতো লোক জমায়েত হইয়া নামাজ পড়িতেছেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। অল্প বয়স্ক দু'একজন মাত্র যুবককে নামাজ পড়িতে দেখিলাম। এই প্রসঙ্গে আমাদের ঢাকার চকবাজারের মসজিদের নামাজ জমায়েতে মুসল্লিদের কথা মনে পড়িল।

এখানেও নামাজরত মুসল্লিদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই অধিক। যুবকদের সংখ্যা নখে গোনা যায়। সমাজতন্ত্রবিরোধী কোনও কোনও লোক আমাদের দেশে ঘটা করিয়া প্রচার করেন সোভিয়েত দেশে মুসল্লিদিগকে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মসজিদগুলি হয় ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা সেখানে গভর্নমেন্টের অন্যান্য অফিস বসিয়াছে। আমাদের অসাম্য-ভরা দেশে যদি কেহ জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য কোনও প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন তাহাদিগকে থামাইয়া দেওয়ার জন্য উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারকার্য এক অভিনব কৌশল। সোভিয়েত দেশের অতিথি হইয়া ইহাদের অতিথিপরায়ণতায় বহুবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন এ দেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নাই। চক্ষু মেলিয়া যাহারা সত্যকে অস্বীকার করেন, আল্লাহ যেন তাহাদের ক্ষমা করেন।

এখানে আসিয়া মনে হইল রুশ সভ্যতা এ দেশবাসীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। বহুলোক এখনও এ দেশের জাতীয় পোশাক পরে। মেয়েদের পোশাকেও ইউরোপীয় অনুকরণ নাই। অতীতে তাসখন্দের মেয়েরা যে পোশাক পরিয়া থাকিত এখনকার মেয়েরাও সেই পোশাক পরে। একমাত্র পার্থক্য বোরখার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এখনকার মেয়েরা বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। তার ফলে শিক্ষায়-দীক্ষায় ইহারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলে। এ দেশেও ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীদের অনুপাতও অনেকটা তেমনই। অল্পক্ষণেই নামাজ শেষ হইল। আমাদের দেশের মতো ভিখারী আসিয়া নামাজীদের ঘিরিয়া ধরিল না। সোভিয়েত দেশে ভিখারী নাই। কোনও রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কেহ পানির গ্লাস লইয়া মুসল্লিদের দিয়া তাহার উপর ফুক পড়াইয়া কুসংস্কার ঘরে লইয়া গেল না। এ দেশে কাহারও অসুখ হইলে বিনা ভিজিটে ডাক্তার ডাকিয়া তাহার চিকিৎসা করায়।...

আমাদের দেশে চার মাইল বা পাঁচ মাইলের মধ্যে একজনও ডাক্তার নাই। এ দেশে ডাক্তারের ছড়াছড়ি; যেখানে সেখানে হাটে-মাঠে-বাটে সর্বত্র ডাক্তার। রেলস্টেশনে ডাক্তার, উড়োজাহাজের স্টেশনে ডাক্তার, হোটেলে ডাক্তার, তারপর পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার। যাকে যখন খুশি ডাক দিলেই হইল। তিনি তার কমপাউন্ডার সঙ্গে লইয়া তখনই আসিয়া হাজির হইবেন। টাকা-পয়সা ভিজিটপত্র দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ... ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মায় বই-পুস্তক সবই রাষ্ট্র বহন করে। ...ব্যবসা-বাণিজ্য দোকানপাট সবই রাষ্ট্রের হাতে। সব জায়গায় জিনিসপত্রের এক দাম। যেখানে যতগুলি দোকানের প্রয়োজন সেখানে ততগুলি দোকান আছে। আমাদের দেশের মতো অনেক দোকান খুলিয়া জাতির জনশক্তির অপব্যয় এরা করে না। ...

সাতলানা জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা বলুন তো আপনার পুর্ববাংলা কেমন দেশ?' আমি বলিলাম, 'পৃথিবীতে কত দেশই তো দেখিলাম, তোমাদের দেশও দেখিলাম। ভারি সুন্দর। কিন্তু আমার পূর্ববাংলাকে আমার আরও ভাল লাগে। পুর্ববাংলার সারা দেশ ভরিয়া শ্যামল-শস্যের আলপনা আঁকা। সেই শ্যামল শস্য ভরা মাঠেরও কত রঙ! ফিকে সবুজ, ঘন সবুজ, হলুদে কালোতে মেশা সবুজ। পাটের ক্ষেত, ধানের ক্ষেত, মটর মসুরির ক্ষেতে কত রঙেরই সবুজ। এর রূপ দেখিয়া চোখের তৃষ্ণা বুঝি মেটে না। এর হাটে গান, মাঠে গান, ঘাটে গান। সমস্ত দেশে যেন অপূর্ব গেঁয়ো গানের ছড়াছড়ি। আর তারই ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে কত সুন্দর সুন্দর নদী। একবার আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সভায় বক্তৃতা করিতে। সেই সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম, 'আমাদের শ্যামল দেশটি যেন এক অপূর্ব বীণাযন্ত্র। কে এক অদৃশ্য সুরকার এই নদীগুলির রূপালী তারে তার কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া এই দেশের অপূর্ব ভাটিয়ালী সুর রচনা করিয়া যাইতেছে।'

সাতলানা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার দেশের এই অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই যাইয়া আপনার দেশে বেড়াইয়া আসি। আপনার দেশের লোকগুলির কথা বলিলেন না? তাহাদের কথাও বলুন।' আমি উত্তর করিলাম, 'এমন সুন্দর দেশে আমাদের সকল থাকিয়াও যেন কিছুই নাই। তোমাদের দেশে যেমন সব লোক সমান, আমাদের দেশে তেমন নয়। বিশ বছর হইল আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আমরা দেশের জনগণ দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তুমি যদি আমাদের দেশে যাও দেখিবে, মুষ্টিমেয় লোক কেহ কেহ বড় বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া, কেহ কেহ দেশ-বিদেশে বাণিজ্য প্রসারিত করিয়া, কেহ কেহ বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে আসীন হইয়া ধনসম্পদে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। আর অগণিত জনগণ রোগে-ব্যাধিতে-অনাহারে ধাপে ধাপে নিচে নামিয়া যাইতেছে। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কতগুলি লোকের করতলগত হইয়াছে। সেই করতল দিনে দিনে আরও প্রসারিত হইতেছে।'

...আমার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের কাহিনী শেষ হইতে চলিল। ... সন্ধ্যা হইলে মিঃ সিডারফের বাসায় মিঃ গঙ্কোওস্কির সঙ্গে দেখা করিলাম। এমনি হাসিখুশি মানুষটি। আমার জন্য কয়েকটি উপহার লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলাম। এ দেশে আসিয়া আমি কোথায় কোথায় গিয়াছি, কোন জায়গা আমার কেমন মনে হইয়াছে তন্ন তন্ন করিয়া তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই আলোচনার সময় একটি কথা আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'এশিয়ার সর্বহারাদের দুইটি মাত্র চক্ষু। একটি সোভিয়েত দেশ;আর একটি মহাচীন। এই দুই দেশের দিকে সকল দেশের সর্বহারারা বড় আশায় চাহিয়া আছে। আপনাদের আদর্শের কতক লইয়া তাহারা একদিন আপনাপন রাষ্ট্রকে আরও উন্নত করিয়া গড়িবে।'...

একজন রুশ ভদ্রলোক আমাকে একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সোভিয়েত দেশে আসিয়া কোন জিনিসটি আপনার খুব ভাল লাগিল?'

আমি বলিলাম, 'এ দেশে আসিয়া আমার সবচাইতে ভাল লাগিল, আপনারা আপনাদের জনগণকে সব চাইতে উচ্চ আসন দিয়াছেন। আর আপনাদের গভর্নমেন্টের সহিত জনগণ একাত্ম। সেই জন্য আপনাদের দেশ যেন কোনও যাদুকরের যাদু-স্পর্শে উন্নতির শিখর হইতে শিখরে আরোহণ করিতেছে। মস্কো, লেনিনগ্রাড যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আমি আপনাদের এই অগ্রগতির কাহিনী রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি।' বিদায় সোভিয়েত ভূমি, বিদায়! রূপে ঐশ্বর্যে আদর্শবাদে তুমি সকল দেশের অনুকরণযোগ্য।

(বানান অপরিবর্তিত)